OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 381 - 386
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 381 - 386
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

প্রেমচন্দ এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন

ড. সুবীর ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: subirghosh@bhu.ac.in
0000-0002-4898-5502

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Comparative analysis, thematic focus, milieus, illiteracy, political sovereignty, self-determination.

Abstract
This study undertakes a comparative analysis of female characterization in the works of Premchand (1880–1936) and Sarat Chandra Chattopadhyay (1876–1938), two seminal figures in early 20th-century Indian literature. Despite their shared humanistic sensibilities, the authors differ significantly in thematic focus, socio-economic setting, and narrative treatment.

Premchand's fictional women—Suman (Sevasadan), Dhaniya (Godan), and Gayatri (Premashram)—are rooted in agrarian and labouring milieus, confronting systemic poverty, illiteracy, and patriarchal oppression. Their agency often extends beyond the domestic sphere into social reform and nationalist engagement, reflecting Premchand's conviction that women's liberation is intrinsically bound to broader struggles for political sovereignty and socio-economic justice.

Conversely, Sarat Chandra's heroines—Sumitra (Pather Dabi), Kamal (Sesh Prashna), and Madhabi (Barodidi)—emerge primarily from urban or semi-urban, middle-class contexts. They prioritize personal autonomy, emotional fulfilment, and moral resistance to regressive traditions. While their involvement in nationalist politics is indirect, their assertiveness signals a political consciousness embedded in individual self-determination.

Economically, Premchand's women endure the rigors of manual labour while maintaining dignity and self-respect, symbolizing rural resilience. Sarat Chandra's women display domestic economic acumen, though their narratives seldom intersect with agrarian realities. Familiarly, Premchand adopts a realist approach—women fulfil conventional responsibilities yet function as agents of change—whereas Sarat Chandra foregrounds emotional bonds, often privileging moral integrity over social conformity.

Taken together, the two authors construct a composite, multidimensional portrait of Indian womanhood, balancing collective rural struggles with individual urban assertions. This synthesis offers enduring

insights into the intersections of gender, class, and socio-political transformation in colonial India.

Discussion

ভারতীয় সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাসে নারীর অবস্থান একটি গতিশীল ও বহুমাত্রিক বিষয়। প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নারীর সামাজিক মর্যাদা, অধিকার ও প্রতিনিধিত্বের ধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। বৈদিক সাহিত্যে (১৫০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্ব) নারীর অবস্থান ছিল অত্যন্ত উচ্চ ও সম্মানজনক। ঋগ্বেদে নারীদের 'ধেনু' (জ্ঞানদাত্রী) এবং 'বধূ' (গৃহের আলো) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১] গার্গী, মৈত্রেয়ীর মতো বিদুষী নারীরা ব্রহ্মজ্ঞান চর্চা করতেন। অর্থাৎ সমাজে নারীর শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত ছিল। স্ত্রীধন প্রথার মাধ্যমে নারীর সম্পত্তির অধিকারও স্বীকৃত ছিল। স্বয়ংবর প্রথার মাধ্যমে নারী তার জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারতেন। যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপে নারীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে, বিশেষত ধ্রুপদী সাহিত্যের যুগে (৫০০ খ্রিস্টপূর্ব-৬০০ খ্রিস্টাব্দ) নারীর অবস্থান সমাজে সংকুচিত হতে থাকে। মনুস্মৃতিতে নারীর উপর নানান বিধিনিষেধ আরোপ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথার আভাস পাওয়া যায়। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনকালে নারীর অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ ও নারী শিক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়; শুরু হয় পর্দাপ্রথার প্রচলন। আবার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে (১৮০০-১৯৪৭) নারী জাগরণ ও নারীশিক্ষার মাধ্যমে পুনরায় নারীমুক্তি আন্দোলন গতি পায় এবং স্বাধীনতা পরবর্তীযুগে নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্মক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ভারতীয় সাহিত্যে নারীর অবস্থানের এই দীর্ঘ যাত্রাপথ সমাজের গতিশীলতারই প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে। বৈদিক যুগের স্বাধীনতা থেকে মধ্যযুগের সংকোচন এবং আধুনিক যুগের পুনরুত্থান - এই পরিবর্তনশীলতা ভারতীয় সমাজেরই অংশ। সাহিত্য যেহেতু সমাজের এই বাস্তব ঘটনা প্রবাহকে ধারণ করে, লালন করে, ফলত সাহিত্যিকদের কলমেও এই বাস্তবতারই প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়। মুন্সি প্রেমচন্দ এবং শরৎচন্দ্র দু'জন ভিন্ন ভাষার সাহিত্যিক; তা সত্ত্বেও, দু'জনেই যেহেতু সমসাময়িক, স্বাভাবিক নিয়মে চরিত্রগুলিও মোটামুটি একই যুগচেতনার ফসল। কিন্তু স্থান ভেদে এবং সংস্কৃতি ভেদে স্বাতন্ত্র্যও নেহাত কম চোখে পড়ে না।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সাহিত্যে নারীর অবস্থান প্রায় অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। তবে সেখানে নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন পুরুষের সেবাদাসী। এর প্রধান কারণ হল, প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রায় সব কাব্য ও নাটকের নায়ক পুরুষ। এমনকি রচয়িতাও পুরুষ। দ্বিতীয়ত, মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলুপ্তির পর সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন হয়। ফলে পুরুষের দৃষ্টিতেই নারীকে দেখার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। এজন্য পুরুষের সুরক্ষা, সম্মান, স্থান, ক্ষমতা, অধিকার এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্য ধর্মশাস্ত্রগুলি বহু নীতি, নিয়ম, বিধি ও শ্লোক রচনা করেছিল, যেগুলি নারীর জীবনকে বহু সামাজিক-নৈতিক বাঁধনে আবদ্ধ করে তোলে। মুসলমান শাসনকালে এই বাঁধন আরও তীব্রতর হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে পাশ্চাত্য প্রগতিশীলতার আলো ভারতীয় সমাজে ছড়িয়ে পড়লে ধীরে ধীরে এই বাঁধন কিছুটা লঘু হতে থাকে। হিন্দি সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাকার মুন্সি প্রেমচন্দ যেহেতু এই ঔপনিবেশিক যুগেই সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তাই তাঁর কলমও এই যুগরুচিকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। তবে তাঁর অঙ্কিত নারী চরিত্রগুলি বহুমাত্রিক। তাঁর রচনায় নারীর বিভিন্ন অবস্থান চিত্রিত হয়েছে। যেমন— ধর্মনিষ্ঠা সম্পন্ন নারী, সমাজ-প্রথানুগত নারী, সহনশীলা নারী, স্বাধীনচেতা নারী, কর্তব্যনিষ্ঠ নারী, স্বার্থপর চক্রান্তকারী নারী, রাজনৈতিক নারী, দেশপ্রেমিক নারী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মাতৃরূপা নারী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভগিনী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কন্যা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সহধর্মিণী ইত্যাদি নানান রূপে নারীর প্রতিচ্ছবি তাঁর রচনায় অনায়াসলক্ষ্য।

ছোটগল্প অপেক্ষা উপন্যাসগুলিতে প্রেমচন্দের অঙ্কিত নারী চরিত্রগুলি অধিকতর পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বৈচিত্র্য নিয়ে উপস্থিত। প্রেমচন্দের রচনায় সেবাপরায়ণ ও পতিগতপ্রাণা নারীর রূপ পাওয়া যায় 'বরদান' উপন্যাসে সুবামা, চন্দ্রা, মাধবী চরিত্রগুলির মধ্যে; 'সেবাসদন' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র সুমনের মধ্যে এবং 'প্রেমাশ্রম' উপন্যাসের বিদ্যাবতী ও শ্রদ্ধা'র মধ্যে। এছাড়া 'নির্মালা' উপন্যাসের কৃষ্ণা, 'রঙ্গভূমি' উপন্যাসের রানি জাহ্নবী ও ইন্দু, 'কায়াকল্প' উপন্যাসের লোউগি, 'গবন' উপন্যাসের রতন, রামেশ্বরী, জালপা ও জোহরা, 'গোদান' উপন্যাসের ধনিয়া, গৌবিন্দি ও সিলিয়া প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলি

একেবারেই পতিগতপ্রাণা ও সেবাপরায়ণ নারী। যারা ভারতীয় সনাতনী ঐতিহ্যকে শিরোধার্য মেনে নিয়ে পতিসেবাকেই জীবনের পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন। আবার মানব সেবায় নিবেদিতপ্রাণ চরিত্র হিসাবে পাই, 'প্রতীজ্ঞা' উপন্যাসের প্রেমাকে। যে অনাথ, আশ্রয়হীন মহিলাদের জন্য অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার লক্ষে নিজে তো নিয়োজিত ছিলই, সেইসঙ্গে আমজনতাদেরও চাঁদা আদায় করে এই মহান সংকল্পকে চরিতার্থ করার জন্য নিজের বক্তৃতার মাধ্যমে উদ্বোধিত করেছেন। 'রঙ্গভূমি' উপন্যাসের সোফিয়ার মধ্যেও গরিবের প্রতি একই রকম সহানুভূতি ছিল। এ উপন্যাসের আর একটি স্ত্রী চরিত্র রানি জাহ্নবীও প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী ও সেবা পরায়ণ চরিত্র, যে দেশের জন্য নিজের সন্তানকেও বিসর্জন দিতে কুন্ঠাবোধ করেননি। 'গবন' উপন্যাসের জালপা এক রোমাঞ্চকর নারী চরিত্র। যাকে প্রথম দিকে আভূষণপ্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক হিসাবে দেখানো হলেও, স্বামী রমানাথ ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর মধ্যেও পরিবর্তন আসে। রমানাথের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অপবাদ ('গবন') দূর করার জন্য সে নিজের অতিপ্রিয় গহনা পর্যন্ত বিক্রি করতে সে দু'বার ভাবেনি। তাঁর সেবাপরায়ণতা দেখে পেশায় বারবণিতা জোহরাও নিজের চরিত্র পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বন্যায় ভেসে যাওয়া মহিলা এবং তাঁর সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে জোহরা নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি। এ হেন জোহরা সম্পর্কে তাঁর স্রষ্টা প্রেমচন্দের উক্তিটি প্রানিধানযোগ্য –

> "जोहरा ने अपनी सेबा, आत्मत्याग और सरल सब्बाब से सभी को मुग्ध कर लिया था। आपने अतीत को मिटाने ने के लिए, अपनी पिछले दैगो को धो डालने के लिए, उसके पास इसके सिबा और किया साधन था। उसकी सारी कामनाएँ, सारी बासनाएँ सेबा में लीन हो गयी।"[২]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ছিল বাঙালি সমাজের জন্য এক পরিবর্তনের কাল। এই সময়ে একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার আন্দোলন, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও নারীশিক্ষা আন্দোলনের ইতিবাচক ফলাফল যেমন দেখা যাচ্ছিল; অন্যদিকে সমাজের গভীরে রয়ে গিয়েছিল নারীর প্রতি কঠোর রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার ও নারীকে অবদমিত করে রাখার প্রবণতা। নারীর জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ ছিল বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীত সমস্যা, কৌলীন্য প্রথা, পণ প্রথা ও অধিকারহীনতার অভিশাপ। এই সময়ে সমাজের একাংশে পরিবর্তনের স্রোত বইলেও সাধারণ গ্রামীণ ও মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ ছিল তখনো রক্ষণশীল। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ছিল এই সমাজবাস্তবতারই প্রতিফলন। তিনি দেখিয়েছেন সমাজ নারীর জীবনকে সংকীর্ণ করে রাখলেও, তাদের ভেতরে লুকিয়ে আছে অসীম প্রেম, শক্তি, আত্মত্যাগ ও বিদ্রোহী সত্তা। তাঁর নারীচরিত্রে তাই একদিকে রয়েছে সকরুণ বাস্তবতা, অন্যদিকে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনার আলোকচ্ছটা। শরৎচন্দ্রের রচনায় নারীর অবস্থান কেবল প্রেমের সম্পর্ক বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমাজ ও পরিবারে নারীর আসন কীভাবে গড়ে উঠেছে, তা তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার সমাজ ছিল অতি রক্ষণশীল, যেখানে নারীর স্বাধীনতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। পরিবারের মধ্যে নারীকে গৃহিণীর ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখা হত ঠিকই, কিন্তু সমাজের চোখে তার প্রধান পরিচয় ছিল শুধুই পুরুষ-নির্ভরতা। নারীকে পরিবারে সাধারণত দুই রূপে দেখা হত — মা বা স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে তার অবস্থান নির্ভর করতো স্বামীর ইচ্ছা ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উপর। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের চরিত্রে দেখা যায়, স্বামী ও পরিবারের চাপে নারীর ব্যক্তিগত অনুভূতি কীভাবে বিসর্জিত হয়েছে। 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী পরিবারের স্বীকৃতি হারিয়ে সমাজের চোখে কলঙ্কিনী হয়েছেন, অথচ তার চরিত্রের দৃঢ়তা ও আত্মমর্যাদা ছিল অকল্পনীয়। 'পল্লীসমাজ'-এর রমা চরিত্র দেখায়, পরিবার ও সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নারীকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপনের অধিকারটুকু পর্যন্ত দিতে চায় না।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে শুধু নারীর দুঃখকথা বর্ণনা করেই থেমে যাননি, বরং তিনি সমাজে নারীর মুক্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন জরালো ভঙ্গিতে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মানবিক, প্রগতিশীল এবং সময়ের তুলনায় অনেক অগ্রবর্তী। শরৎচন্দ্র নারীমুক্তিকে কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাননি। তাঁর মতে, নারীমুক্তি মানে— সমাজের চোখে নারীকে মানুষ হিসেবে দেখা; নারীর স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং নিজের জীবনসঙ্গী ও জীবনপথ বেছে নেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তিনি মনে করতেন, পুরুষ ও নারী সমান মর্যাদার অধিকারী;

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 381 - 386
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমাজের কাঠামোকে এই সত্য স্বীকার করতে হবে।[৩] তাই তো 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের কমল সাহস করে সমাজের প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিজস্ব অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর বুদ্ধি, যুক্তিবাদিতা এবং আত্মসম্মান নারীকে সমতার উচ্চতায় নিয়ে গেছে। 'দত্তা' উপন্যাসের বিজয়াও নিজের বিবাহ ও প্রেম নিয়ে আপসহীন। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের অচলা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী স্বাধীনচেতা ও উচ্চাভিলাষী। স্বামী মহিমের তৈরি গণ্ডিতে সে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে রাজি নয়। তাই নিজের স্বপ্ন ও আবেগকে মর্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর অচলা স্বামীর বন্ধু সুরেশের প্রতি আসক্ত হয়েছেন অনায়াসে। অন্যদিকে সমাজ কলঙ্কিনী ভাবলেও 'শ্রীকান্ত'-এর রাজলক্ষ্মী বা অভয়া নিজের মানবিক মর্যাদা ও সহানুভূতির জন্য অমর হয়ে আছেন। শরৎচন্দ্র বারবার নারীর শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে নারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি অর্জন করে, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র কমল এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র মনোরমা, নীলিমার মধ্যেও কিছুটা একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া রমা, বিজয়া প্রমুখ নারী চরিত্রেও এই শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদাশীল নারীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্রের কলম সরাসরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। শরৎচন্দ্রের প্রগতিশীলতা তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটে যুগান্তকারী। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে যখন সমাজ নারীর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিল না, তখন শরৎচন্দ্রের সাহিত্য নারীর মুক্তিকে সামনে এনে দিয়েছে। তাঁর কলমে নারী কখনো কেবল মায়া-মমতার প্রতীক নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি। তাঁর নারীচরিত্ররা প্রায়শই সমাজের নির্যাতন ও অবহেলার শিকার, কিন্তু তাঁরা একেবারেই নিষ্প্রভ বা ভীরু নন। বরং দুঃখ-অবমাননার মধ্য দিয়ে তাঁরা ধীরে ধীরে এক প্রতিবাদী ও আত্মমর্যাদাশীল সত্তায় পরিণত হয়েছেন।[৪] পতিতা, বিধবা, গৃহবধূ বা প্রেমিকা— সব নারীই তাঁর কাছে সমান মর্যাদাসম্পন্ন। 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী, 'শ্রীকান্ত'-এর রাজলক্ষ্মী, 'দেবদাস'-এর চন্দ্রমুখী —তাঁরা সমাজের চোখে ভিন্ন পরিচয়ের হলেও শরৎচন্দ্র তাঁদের মানবিকতাকেই প্রধান করে তুলেছেন, চারিত্রিক স্খলনকে নয়। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নারীর অবস্থান নিয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছেন— সমাজ যাকে 'চরিত্রহীন' বলে চিহ্নিত করে, সে কি সত্যিই চরিত্রহীন? সমাজ কিরণময়ীকে চরিত্রহীন বলে মনে করে, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে আত্মমর্যাদাশীল, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ নারী। চার খণ্ডে প্রকাশিত সুবৃহৎ উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'-র রাজলক্ষ্মী পতিতা হলেও তাঁর চরিত্রে আছে অদম্য মানবিকতা, প্রেম ও আত্মমর্যাদা। সমাজ তাঁকে অবহেলা করলেও, শ্রীকান্তের জীবনে তিনি মহিমান্বিতা। পতিতার মধ্যেও যে বিশুদ্ধ প্রেম, আত্মত্যাগ থাকতে পারে, শরৎচন্দ্র সেটিই দেখিয়েছেন। এ উপন্যাসের অভয়া ও অবলা চরিত্রের মধ্যেও অপরিসীম মানবিকতা, ভালোবাসা ও আত্মমর্যাদার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছে। 'পথের দাবী'র সুমিত্রার মধ্যে স্পষ্ট বিদ্রোহী সত্তা লক্ষ্য করা যায়। সে অন্যায়, শোষণ মেনে নিতে পারে না। তার কথাবার্তা, মতামত ও জীবনযাত্রা তাকে নারীদের প্রচলিত গণ্ডি থেকে আলাদা করে তোলে। ফলে পাঠকের কাছে অনন্যা এক স্বাধীনচেতা ও স্বতন্ত্র চরিত্রে পরিণত হয়েছে। শরৎচন্দ্র এ উপন্যাসেই প্রথমবারের মতো দু'জন নারী চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন, যারা সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের একজন সুমিত্রা, অন্যজন ভারতী। সুমিত্রার ব্যক্তিত্বের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল— সে প্রেমে মগ্ন হলেও আদর্শ বিসর্জন দেয় না। প্রেম তার কাছে দুর্বলতার প্রতীক নয়, বরং সংগ্রামী জীবনের এক শক্তি। এখানে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন যে প্রেম ও দেশপ্রেম একে অপরের বিরোধী নয়। শরৎচন্দ্র মনে করতেন, প্রেম পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতার ভিত্তি গড়ে তোলে। তাঁর উপন্যাসে প্রেম কেবল রোমান্টিক আবেগ নয়, বরং সামাজিক প্রতিবাদের হাতিয়ার। 'দত্তা'-তে বিজয়া নিজের প্রেমকে সামাজিক প্রথার উপরে স্থান দিয়েছেন। 'শেষ প্রশ্ন'-এ কমল প্রেমকে আত্মমর্যাদার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। 'শ্রীকান্ত'-এ রাজলক্ষ্মী দেখিয়েছেন, প্রেমে আত্মত্যাগ থাকলেও তা কখনোই হীনমন্যতা নয়। শরৎচন্দ্র প্রেমকে সামাজিক মুক্তি ও সমতার একটি শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন।

প্রেমচন্দ এবং শরৎচন্দ্রের নারীভাবনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গেলে সর্বাগ্রে বলতে হয়, নারীকে সাহিত্য রচনা প্রেমচন্দ বা শরৎচন্দ্রের হাতেই প্রথম, এমনটা একেবারেই নয়। বিশ্বের সমস্ত ভাষার সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকেই নারী বিষয়ক রচনাবলীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়— প্রাচীন মহাকাব্য থেকে আধুনিক কাব্য-কবিতা-গল্প-উপন্যাস —প্রতিটি শাখায় নারীজীবনের আখ্যান বিদ্যমান। নারী জীবন ও নারীর মানসিকতার চিত্রায়ণ সাহিত্যচর্চার অন্যতম প্রধান বিষয় যেমন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 381 - 386
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অতীতে ছিল, বর্তমানেও তেমনই রয়েছে। হিন্দি সাহিত্যে নারীর অবস্থান যুগের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। যুগোপযোগী পরিস্থিতির ভিত্তিতেই নারীকে সাহিত্যে রূপায়ণ করা হয়েছে। ভারতীয় নারীর ঐতিহাসিক চিত্র গভীর প্রভাববাহী এবং সমকালীন মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর তা হিন্দি উপন্যাসের প্রারম্ভিক যুগ থেকেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। হিন্দি উপন্যাসের ক্ষেত্রে মুন্সি প্রেমচন্দই প্রথম দেখালেন যে উপন্যাস কেবলমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং এর মাধ্যমে সমাজের সমস্যাগুলোকে যথাযথভাবে তুলে ধরা যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করা যায়। তাই প্রেমচন্দকে হিন্দি সাহিত্যের প্রথম 'বাস্তববাদী উপন্যাসিক' এবং 'যুগপ্রবর্তক লেখক' বলা হয়।[৫] শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ – দুই ভিন্ন ভাষার দুই মহৎ কথাশিল্পী। তবু নারীর প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি একই সূত্রে গাঁথা। দুজনেই তাঁদের সাহিত্যকর্মে নারীজীবনের দুঃখ-অবমাননা, সংগ্রাম, অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যকে অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও ভিন্ন ভাষায় লিখলেও নারীর প্রশ্নে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সমান্তরাল, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পৃথকও। নারীকে তাঁরা মানবসমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। একদিকে শরৎচন্দ্রের আবেগঘন ও বিদ্রোহী নারীচিত্র, অন্যদিকে প্রেমচন্দের সংগ্রামী ও বাস্তবধর্মী নারীচিত্র — এই দুই মিলে ভারতীয় সাহিত্যকে দিয়েছে শক্তিশালী নারীমুখ।[৬]

উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল ভারতীয় সমাজের অস্থিরতা, জাতীয়তাবোধ এবং সামাজিক সংস্কারের যুগ। এই সময়ে সাহিত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম হয়ে থাকেনি, বরং সমাজ-সংস্কারের হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মুন্সি প্রেমচন্দ — এই দুই ভিন্ন ভাষার ঔপন্যাসিক তাঁদের সাহিত্যকর্মে সমাজের নানা অসঙ্গতি, বিশেষ করে নারীর শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলেছেন। নারীর সামাজিক অবস্থান, শিক্ষার অভাব, বাল্যবিবাহ, বিধবা-অবস্থা, পুরুষতান্ত্রিক শোষণ ইত্যাদি তাঁদের সাহিত্যকর্মে একদিকে যেমন বাস্তবধর্মীরূপে চিত্রায়িত হয়েছে, অন্যদিকে নারীশক্তির সম্ভাবনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতও ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মুন্সি প্রেমচন্দ— দুজনই ছিলেন সমাজসচেতন কথাশিল্পী। তাঁদের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল লক্ষ্য ছিল নিপীড়িত মানুষের মুক্তি, আর তার মধ্যে নারী ছিল অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়। যদিও তাঁদের সৃষ্ট সমাজ ও সংস্কৃতি ভিন্ন, তবুও নারীভাবনায় তাঁদের বহু মিল এবং তাৎপর্যপূর্ণ অমিল লক্ষ্য করা যায়। দু'জন লেখকই নারীকে কেবল গৃহস্থালির অংশ বা পুরুষের ছায়াসত্তা হিসেবে দেখেননি। তাঁরা নারীকে মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'-এর অচলা কিংবা 'দেবদাস'-এর পার্বতী যেমন নিজের প্রেম, ইচ্ছা ও সম্মান নিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন, প্রেমচন্দের 'গোদান'-এর ধানিয়া কিংবা 'নির্মলা' উপন্যাসের নায়িকাও তেমনি কঠিন বাস্তবতাকে লড়াই করে সহ্য করেছেন। দু'জনের সাহিত্যেই নারীর প্রতি সমাজের শোষণ ও অবমাননার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়। শরৎচন্দ্র বারবার আঙুল তুলেছেন বাল্যবিবাহ, নারীর বৈধব্যজনিত ক্ষত, নারীর অশিক্ষা ও সামাজিক কুসংস্কারের দিকে। প্রেমচন্দ বাস্তবচিত্রে তুলে ধরেছেন দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য, পিতৃতান্ত্রিক শোষণ ও অশিক্ষার ভয়াবহতা। নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশ না হলেও তাঁদের সাহিত্য সমাজে সচেতনতা সৃষ্টিতে গভীর প্রভাব ফলেছে। ভারতে উনিশ ও বিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন মূলত শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবা-বিবাহ বৈধকরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়েই ছিল। শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনের আবেগঘন মুখপাত্র, তিনি নারীকে বিদ্রোহী চেতনায় উজ্জীবিত করেছেন। প্রেমচন্দ ছিলেন আন্দোলনের বাস্তবধর্মী ভাষ্যকার, তিনি গ্রামীণ দরিদ্র নারীর কষ্ট তুলে ধরে সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে দেখিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মুন্সি প্রেমচন্দ উভয়েই তাঁদের সাহিত্যকর্মে নারীকে কেন্দ্রীয় আসনে বসিয়েছেন। তবে তাঁদের নারীভাবনার প্রকৃতি ও সামাজিক তাৎপর্যকে বিচার করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য চোখে পড়ে। শরৎচন্দ্র মূলত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের নারীদের কেন্দ্র করে লিখেছেন, যেখানে প্রেম, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রেমচন্দ উত্তর ভারতের গ্রামীণ দরিদ্র সমাজের নারীদের জীবনযুদ্ধ ফুটিয়ে তুলেছেন, যেখানে দৈনন্দিন বেঁচে থাকার লড়াই, দারিদ্র্য ও সংসারের ভারই ছিল প্রধান। শরৎচন্দ্রের নারীরা অনেক সময় বিদ্রোহী, যেমন 'পথের দাবী'-এর সুমিত্রা, যে রাজনৈতিক আন্দোলনে সরাসরি যোগ দেয়। প্রেমচন্দের নারীরা সাধারণত ত্যাগী ও কর্তব্যপরায়ণ, যেমন 'গোদান'-এর ধনিয়া, যে পরিবার ও সমাজের ভার নিজের কাঁধে বহন করেছেন অবলীলায়। শরৎচন্দ্রের কলম আবেগঘন। তাঁর নারীরা কখনো রোমান্টিক, কখনো করুণার প্রতীক। প্রেমচন্দ ছিলেন বাস্তববাদী। তাঁর নারীচরিত্র বাস্তব সমাজ থেকে

নেওয়া, কাহিনিতে কল্পনার স্থান খুবই কম। শরৎচন্দ্রের নারীরা সামাজিক নিয়ম ভেঙে স্বাধীনতার দাবি জানায়, যেমন রাজলক্ষ্মী বা বিজয়া। প্রেমচন্দের নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চললেও তাঁদের নীরব সংগ্রাম সমাজকে ধীরে ধীরে পাল্টাতে সাহায্য করেছে। শরৎচন্দ্রের গদ্যে কাব্যিকতা ও আবেগময়তা প্রবল; পাঠক আবেগে ভেসে যায়। প্রেমচন্দের ভাষা সহজ, নিরাভরণ, লোকজ — যা পাঠককে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। দু'জনের সাহিত্যেই কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। শরৎচন্দ্রের অনেক নারীচরিত্র আবেগপ্রবণ ও অতিমাত্রায় আদর্শায়িত হয়ে গেছে। বাস্তব সমাজে তাঁদের বিদ্রোহ বা প্রেমের শক্তি সবসময় কার্যকর হয়ে ওঠেনি। তাঁর চরিত্ররা অনেক সময় পুরুষনির্ভর। অর্থাৎ পুরুষ চরিত্রের সাথে সম্পর্ক ছাড়া তাঁদের পূর্ণ সত্তা আলাদা করে বোঝা কঠিন। প্রেমচন্দের নারীচরিত্ররা প্রায়শঃ অতিরিক্ত ত্যাগী ও কর্তব্যপরায়ণ হতে দেখা যায়। ফলে তাঁরা বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে কমই প্রতিভাত হন। তাঁর রচনায় নারীশক্তির স্বপ্ন বা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া যায়; বরং বর্তমান বাস্তবতা প্রধান হয়ে ওঠে। তবে শরৎচন্দ্র পাঠকের আবেগকে নাড়া দিয়েছেন গভীরভাবে। তাঁর লেখা নারীচরিত্র বাঙালি পাঠককে ভাবতে বাধ্য করেছে যে নারীও স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে, ভালোবাসতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রেমচন্দ পাঠককে বাস্তব সমাজের কঠিন চিত্র দেখিয়েছেন। তাঁর নারীচরিত্র পাঠককে সহমর্মী ও দায়িত্ববান হতে শিখিয়েছে। দুজনের সাহিত্যই তাঁদের সময়কার সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। শরৎচন্দ্র নারীকে আবেগ ও বিদ্রোহের শক্তি দিয়ে সমাজকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রেমচন্দ নারীকে বাস্তব জীবনের শ্রম ও সংগ্রামের প্রতীক বানিয়ে সমাজকে প্রতিফলিত করেছেন। দুজনের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ মিলিত হয়ে ভারতীয় সাহিত্যে নারীর অবস্থানকে করেছে বহুমাত্রিক ও সমৃদ্ধ।

Reference:

১.https://www.reddit.com/r/Indian_Conservative/comments/1j9iaov/women_in_hinduism/?utm_source=chatgpt.com

২. प्रेमचंद - गबन, राजपाल एंड सन्स, दिल्ली, संस्करण - 2009, पृष्ठा - 262

৩. চৌধুরী, নারায়ণ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ১২, ১৯৬০, পাতা – ৭৪

৪. সেনগুপ্ত, শ্রীসুবোধচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা – ৭৩, ১৯৪৮, পাতা – ৮১

৫.https://hindi.theprint.in/culture/premchand-birth-anniversary-hindi-literaturesahitya/34064/?utm_source=chatgpt.com

৬. तिवारी, सुरेन्द्रनाथ, प्रेमचंद और शरतचंद्र के उपन्यास, सुषमा पुस्तकालय, दिल्ली, सं – १९६९, पन्ना – भूमिका